সূচিপত্র

কবিতা

সৃজন পাল ৩৮
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
অনীক রুদ্র ৪২
দীপক ঘোষ ৪৪
অম্লান বিশ্বাস ৪৫

গল্প

হিসাম বুস্তানি ঃ ফয়সালা আর একতা
অনুবাদঃ জয়ন্ত ঘোষাল ৪৬

বিশেষ রচনা

শোভন পাণ্ডা
মন খারাপের দিস্তা ৩

ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়
ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় ধারণা
অনুবাদঃ সন্দীপ রায় ১২

অভিজিত গুহ
জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের সন্ধানে
একটি পর্যালোচনাঃ ২১

শৈবাল দত্ত
বাংলায় উপনিবেশিকতা প্রতিরোধ ও শিকার ২৭

সুমিত মুখোপাধ্যায়
পরিবেশের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের পরিবেশঃ
মহামারীর প্রেক্ষিতে ৪৯

জয়দীপ সেনগুপ্ত
একটি প্ল্যানডেমিক যা মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে
অনুবাদঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪

বহ্নিবরণ ঘোষ
পলিটিক্যাল ইকনমির দৃষ্টিতে অতিমারী ও রাষ্ট্র ৫৮

সুজিত চৌধুরী
গরম চা ও এক চিলতে মৃত্যু ৬২

অরুন্ধতী রায়
কাশ্মীরে মোদীর নৃশংস তামাসায় উদ্ঘাটিত তার কৌশল, দুর্বলতাও ঃ
অনুবাদঃ গীতা সোম ৬৭
(কৃতজ্ঞতা ঃ দ্য গার্ডিয়ান আগস্ট ৫, ২০২০)

দিলীপ রায়
অবরুদ্ধ কাশ্মীর স্তব্ধ সময় রাজপথে বুটের কুচকাওয়াজ ৭০

রিপোর্ট

হিমাদ্রি ঘোষ
বাংলায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদের মুখ
অনুবাদঃ প্রান্তিক ঘোষ ৭৫
কৃতজ্ঞতা : দ্য ওয়্যার (The Wire) (হোয়াটসঅ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

পরিকল্পনা সম্পাদনা বিন্যাস

রূপায়ণ ও সহায়তা

অজন্তা ঘোষ অরিন্দম পাল কুণাল দেব গীতা সোম
চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় জয়শ্রী গাঙ্গুলি জয়া মিত্র দিলীপ রায়
প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীর মুখোপাধ্যায় বিজয়া চন্দ
রুনা বসু শম্পা মিত্র শৈবাল দত্ত সন্দীপ রায়
সুব্রত মজুমদার সৃজন পাল

এই সংখ্যা নির্মাণে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা

নির্মলেন্দু শাসমল শিবব্রত কর্মকার সুজিত চৌধুরী
অশোক প্রামাণিক সুবিমল ভট্টাচার্য পূর্ণব্রত মিত্র
অম্লান বিশ্বাস ও মনোজ দে

প্রচ্ছদ

সমীর ভট্টাচার্য

বিন্যাস ও অলঙ্করণ

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস

বিশ্বকর্মাপ্রেস, ২/১এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৯

মুদ্রণ ঃ এস. এস. প্রিন্ট, ৮, নরসিং লেন, কলকাতা ৯

সহযোগী সম্পাদক

জয়হিন্দ বসু

সম্পাদক

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়

কার্যালয় ও যোগাযোগ

২/১এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৯
৮, দীননাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৫৬
ই-মেইল ঃ praschat@gmail.com
মোবাইল ঃ 9830227186

ছবিঃ ফিলিপাইনসের এক কারাগারে বন্দী থাকাকালীন অজ্ঞাত কোন শিল্পীর আঁকা।

(প্রচ্ছদঃ কালধ্বনি, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮৬)

অভিজিত গুহ

জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের সন্ধানেঃ একটি পর্যালোচনা

সূচনা

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাসচর্চায় একটি অবহেলিত অধ্যায়। ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাস যে দিকপাল নৃতত্ত্ববিদরা রচনা করেছেন, যেমন বিরজাশঙ্কর গুহ, ধীরেন্দ্রনারায়ন মজুমদার, নির্মলকুমার বসু এবং এল.পি. বিদ্যার্থী, এঁরা কেউই জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের উপর আলোকপাত করেন নি। ভারতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনা যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় কিংবা সাম্প্রতিককালে রোমিলা থাপারের অবদানে যেমন একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত সেরকমটা নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে ঘটেনি। অথচ দেশ গঠনের কাজে নৃতত্ত্বের অবদান অনস্বীকার্য। আজও ভারতীয় নৃতত্ত্ব যেন পশ্চিমী নৃতত্ত্ব দ্বারাই প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় যে কথাটা বলতে চাই সেটা হল জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব বলতে আমি উগ্র স্বাদেশিকতা সম্পৃক্ত, ধর্মীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একদেশদর্শী কোন নৃতত্ত্বের কথা বলতে চাইছি না। আমার ব্যাখ্যায় জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব হল দেশ গঠনের কাজে নিযুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বলিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার একটি নতুন ধারা যার পর্যালোচনা ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাস রচনায় এযাবৎকাল অনুল্লিখিত। এরকম একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আমি ভারতীয় নৃতত্ত্বের উপর সমালোচনামূলক ভাষ্যগুলির একটি ধারাবিবরণী উপস্থাপনের মাধ্যমে শুরু করব।

ভারতীয় নৃতত্ত্ব কি আসলে ঔপনিবেশিক?

বিগত বেশ কয়েক দশক যাবৎ ভারতীয় নৃতত্ত্বকে পশ্চিমী নৃতত্ত্বের অন্ধ অনুগামী একটি ধারা হিসেবে দেখার প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। ভারতে নৃতত্ত্বচর্চার প্রতিষ্ঠাতা নিঃসন্দেহে ব্রিট্রিশ প্রশাসক ও পণ্ডিতবর্গ। সমালোচকদের বক্তব্য ছিল এরকম। ব্রিটিশ প্রশাসক পণ্ডিতরা ভারতে নৃতত্ত্বচর্চার যে ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকরা সেই ঔপনিবেশিক ধারা অতিক্রম করে নৃতত্ত্বকে সত্যিকারের ভারতীয় করে তুলতে পারেননি। যদিও বিষয়টির গবেষণা ও পাঠের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। যাঁরা ভারতীয় নৃতত্ত্বের এই সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই নৃতাত্ত্বিক এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত। সমালোচনার এইধারায় প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন সুরজিৎ সিংহের নাম। ভারতীয় নৃতত্ত্বে সুরজিৎ সিংহ একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ভারত সভ্যতার নির্মাণে আদিবাসী ও জাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ও ধারাবাহিকতার ক্রমান্বয় সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণায় সুরজিৎ সিংহের অবদান আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। সুরজিৎ সিংহ ১৯৭১ সালে ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান সমাজের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধটির শিরোনাম 'Is There an Indian Tradition in Social/Cultural Anthropology : Retrospect or Prospect?' এই প্রবন্ধে সুরজিৎবাবুর প্রধান বক্তব্য ছিল বিগত ১০০ বছরে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকরা পশ্চিমী এবং ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্বের উপরেই প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এরপর ১৯৭৪ সালে সুরজিৎবাবু একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের ভূমিকায় প্রায় একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন। লেখকের ভাষায়ঃ "ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে অগ্রণী পূর্বসূরী ও সমকালীন নৃতাত্ত্বিকদের প্রকাশিত গবেষণাগুলির সম্পর্কে একটি অনীহা দেখা যায়। এর ফলে উক্ত গবেষকবৃন্দের প্রচেষ্টাগুলি মৌলিকত্বের অভাবে দুষ্ট। আর সেকারণেই নতুন চিন্তাভাবনার সমস্ত দায়িত্ব তারা ছেড়ে দেন পশ্চিমী গবেষকদের উপর (সিংহ ১৯৭৪)।"

সুরজিৎ সিংহের পর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের দুই অধ্যাপক অমিতাভ বসু ও সুহাস বিশ্বাস ১৯৮০ সালে তাঁদের বিতর্কিত প্রবন্ধ 'Is Indian Anthropology Dead/Dying?' লেখেন। বসু এবং বিশ্বাস ভারতীয় নৃতত্ত্বকে সামাজিক দায়িত্ব বিবর্জিত ও মৃতপ্রায় একটি বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন। বেশ কয়েক জন নৃতাত্ত্বিক ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সমাজের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের উপর তাঁদের মন্তব্যে আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন যে বসু ও বিশ্বাসের পর্যবেক্ষণ মেনে নেওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় নৃতত্ত্ব কারুর কাজে লাগেনি এটা বলা যায় না। ভারতীয় নৃতত্ত্ব এযাবৎ কালশাসক শ্রেণী ও সমাজের সুবিধা ভোগী গোষ্ঠীর উপকারে নিয়োজিত। আপামর জনসাধারণের জন্য বিষয়টির প্রায় কোন অবদান নেই (বসু ও বিশ্বাস ১৯৮০)। এরপর প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী আন্দ্রেঁ বেতে তাঁর এক গবেষণাপত্রে আমাদের জানানঃ ''ভারতবর্ষে সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রতিটি প্রজন্মই নতুনভাবে শুরু করতে আগ্রহী। পূর্বসূরীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ওদের প্রায় কোন রকম আকর্ষণ নেই। পূর্বসূরীদের গবেষণা সম্পর্কে বিস্মৃত ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের এই বৈশিষ্ট্য নতুন কিছু খুঁজে বের করার ব্যাপারে তাদের অকৃতকার্যতা থেকে কোন অংশে কম নয় (বেতে ১৯৯৭)।''

বলাবাহুল্য যে বেতের বক্তব্যের সঙ্গে সুরজিৎ সিংহের পর্যবেক্ষণ মিলে যায়। সিংহের প্রকাশিত প্রবন্ধের পর সুবিখ্যাত ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকায় বিশ্বনাথ দেবনাথ ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের তীব্র সমালোচনা করেন এই বলে যে তাঁরা আজ পর্যন্ত নিজেদের মত করে দেশের উপযোগী একটি নৃতত্ত্ববিদ্যা গড়ে তুলতে পারলেন না। ওরা শুধুই পশ্চিমী প্রভুদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছেন। দেবনাথের পথ অনুসরণ করে জে. জে. রায়বর্মণ তাঁর ২০১১ সালের প্রবন্ধে ভারতীয় নৃতত্ত্বের মধ্যে নয়া-উপনিবেশবাদী চিন্তাধারার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন (দেবনাথ ১৯৯৯ এবং রায়বর্মণ ২০১১)।

হিন্দু নৃতত্ত্ব

ভারতীয় নৃতত্ত্ব ঔপনিবেশিক প্রভুদের অন্ধ অনুগামী, সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান বিবর্জিত ও পূর্বসূরীদের মৌলিক গবেষণা সম্পর্কে বিস্মৃত একটি বিষয় এরকম ধারণার ঠিক উল্টোপিঠে আর একটি চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। আমি ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাস রচনায় এই ধারার নাম দিয়েছি হিন্দু নৃতত্ত্ব। বর্তমান রাজনীতির জগতে হিন্দুত্ববাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে এর মিল খুঁজে বের করা আমার গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। নৃতত্ত্ব বিষয়ে উক্ত মতবাদের অনুগামীরা বিশ্বাস করেন যে ভারতে ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ব শুরু হবার অনেককাল পূর্বেই বেশ কয়েকটি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে নানা নৃতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এনথ্রোপলজিক্যাল পেপারস নামে গবেষণা পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধের শিরোনাম Hindu Anthropology। এই প্রবন্ধের লেখক বলেছেন খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেই তৎকালীন হিন্দুরা মানবদেহের উপর নানা রকমের মাপজোক আবিষ্কার করেছিলেন যা কিনা পরবর্তীকালে ইউরোপে আবিষ্কৃত শারিরীক নৃবিজ্ঞানের (Physical Anthropology) গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা নৃমিতির (Anthrometry) সমতুল্য। প্রবন্ধের শুরুতেই ঘোষ বলেছেনঃ ''নৃতত্ত্ব আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানগুলির মধ্যে অন্যতম। নৃমিতি এবং মানবজাতি তত্ত্ব এই বিজ্ঞানটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই প্রবন্ধে আমরা তথ্য সহযোগে দেখাব যে হিন্দুরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই তাদের নিজস্ব নৃমিতি ও মানবজাতি তত্ত্ব চর্চা করতেন (ঘোষ ১৯৩৮)।'' এরপর উক্ত প্রবন্ধে ঘোষ বলেন যে প্রাচীন হিন্দু-চিকিৎসা বিজ্ঞানগ্রন্থ 'শুশ্রুতসংহিতায়' মানবদেহের উপর বিভিন্ন নৃমিতি সংক্রান্ত মাপজোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে ঋকবেদেই প্রথম মানুষের দেহের চামড়ার রঙ অনুযায়ী মানব জাতিসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে ঘোষের মত অনুযায়ী প্রাচীন হিন্দু মানবজাতি তত্ত্ব (Ethmology) ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানের পূর্বসূরী।

হিন্দু নৃতত্ত্বের আর একজন প্রভাবশালী নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসু (১৯০১–১৯৭২) যিনি এক সময় মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। বসু ১৯২৯ সালে Cultural Anthropology শিরোনামে একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই বইতে বসু বলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে মানবজাতির জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও ক্রিয়াগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভাজিত করা হয়েছিল। এই বিভাগগুলি হল অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। নির্মলবাবুর মতে উক্ত শ্রেণীবিভাজন যেন অনেকটাই বিংশ শতকের উপযোগিতামূলক ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মিলে যায়।অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রকাররা পশ্চিমী উপযোগিতামূলক নৃতত্ত্বের (Functional Anthropology) অনেক আগেই উপযোগিতার তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে গেছিলেন। পরবর্তীকালে বসু আদিবাসী আত্তীকরণের হিন্দুপদ্ধতি (Hindu Method of Tribal Absorption) নামে একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। ১৯৪১ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে নির্মলবাবু তাঁর একটি গবেষণা পত্রে এই তত্ত্বটি লিখিত আকারে পেশ করেন। উড়িষ্যার পাললাহারা অঞ্চলে জুয়াং নামে আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত স্বল্পকালীন ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ যে তথ্য বসু সংগ্রহ করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই আদিবাসী আত্তীকরণের হিন্দুপদ্ধতি নামে তত্ত্বটিকে তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন। এই তত্ত্বটি ভারতীয় নৃতত্ত্বে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী। আজও কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে নৃতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের এই তত্ত্বটি অধ্যয়ন করতে হয়। তত্ত্বটির মূল কথা হল যে সমস্ত আদিবাসীগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী বর্ণহিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসে তারা ক্রমশ নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্ত্বা হারিয়ে হিন্দু সমাজের নিম্নজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ে পরিণতহয়। এটাই ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস। বসুর এই তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি ক্ষেত্রসমীক্ষা দ্বারা যাচাই করার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। আদিবাসী সমাজের হিন্দু আত্তীকরণের এই বৃহত্তর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই নির্মলবাবুর জাতীয়তাবাদী ধারণা গড়ে ওঠে।

সমাজতাত্ত্বিক প্রদীপ বসু নির্মলবাবুর জাতীয়তাবাদী ধারণা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ ''(নির্মল) বসুর বর্ণনায় হিন্দুধর্ম মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী একটি আদর্শ যা কিনা সমাজের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলিকে অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থার মধ্যে একত্রিত করে ফেলে। হিন্দুধর্মের এই আত্তীকরণের ক্ষমতা সম্পর্কে বসুর ধারণা থেকেই আদিবাসীগোষ্ঠীগুলি যে শেষ পর্যন্ত জাতিব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলএই তত্ত্বের ব্যাখ্যা মেলে। এইদিক থেকে দেখতে গেলে বসু অন্যান্য প্রাচ্যবাদী লেখকদের মতই ভারতীয় সমাজের ইতিহাসকে মূলত একটি হিন্দু ইতিহাস হিসেবেই দেখেছেন। এই ইতিহাস অ-হিন্দুদের হিন্দু হয়ে যাবার ইতিহাস (বসু ২০০৭)।''

হিন্দু নৃতত্ত্বের ধ্যান-ধারণাগুলি আজও বর্তমান ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের আকর্ষণ করে চলেছে। সম্প্রতি ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানসর্বেক্ষণের (Anthrpological Survey of India) একদা পরিচালক (Director) অজিতকুমার দণ্ড তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেনঃ

''আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীঃপূর্বে রচিত মানব ধর্ম শাস্ত্র নামক স্মৃতিগ্রন্থ (আক্ষরিক অর্থে মানবসম্পর্কিত বিজ্ঞান) সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম নৃবৈজ্ঞানিক পুঁথি। এরকম দাবী করাই সঙ্গত যে উক্ত গ্রন্থটি অ্যারিস্টটল নামাঙ্কিত এনথ্রোপলজি শব্দটি ব্যবহারের অন্তত ১০০০ বছর পূর্বেই নৃবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রয়োগে নিয়োজিত হয়েছিল।'' (দণ্ড ২০১৭)

অধ্যাপক দণ্ড অবশ্য তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধের কোথাও তথাকথিত 'হিন্দু-নৃতত্ত্বের' পূর্বসূরী বস্তুতান্ত্রিক চার্বাক দর্শনের উল্লেখ করেননি। দণ্ডের আলোচনায় লোকায়ত, আদিবাসী কিংবা দলিত সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনার মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের কোন সন্ধানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। দণ্ডের ভারতীয় নৃতত্ত্ব আসলে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনায় নিয়োজিত। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থের কোন উল্লেখ দণ্ডের লেখায় পাওয়া যায় না। যদিও অজিতবাবুর পূর্বসূরী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মত 'হিন্দু নৃতত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু ওঁর উদ্দেশ্য যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত উচ্চবর্ণীয় শাস্ত্রগুলির মধ্যেই বিশ্বের প্রাচীনতম নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানভাণ্ডার লুকিয়ে আছে এই তত্ত্বটি প্রচার করা এটা পরিষ্কার।

জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব

সাম্প্রতিককালে Anthropology in the East শিরোনামে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে প্যাট্রিশিয়া উবেরয়, নন্দিনী সুন্দর এবং সতীশ দেশপাণ্ডে মুখবন্ধের 'জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্র' শীর্ষক অংশে লিখেছেনঃ

''আমরা এখনও ভারতীয় সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের উপর জাতীয়তাবাদ ঠিক কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে ছিল তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে পারিনি। এটা নিশ্চিত যে উক্ত বিষয় দুটির ব্যক্তিসংক্রান্ত বা প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস রচনায় জাতীয়তাবাদ একটি উপাদান হিসেবে উল্লিখিত।'' (উবেরয়, সুন্দর, দেশপাণ্ডে ২০০৭)

উল্লিখিত মন্তব্যটির পরবর্তী আলোচনায় লেখকরা স্বীকার করেছেন যে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি বিশাল এক বর্ণালীর মত এবং কোন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক অথবা সমাজতাত্ত্বিকই জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন নি। আমি এই প্রবন্ধে ভারতীয় নৃতত্ত্বে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরতে পারব এরকম দাবী করছি না। বেশ কিছুদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার ফলে আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য এসেছে সেগুলিকে পাঠকবর্গের সামনে হাজির করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত তথ্যাবলীর মাধ্যমে যা আমার নজরে এসেছে তাহল ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্বচর্চার পাশাপাশি ভারতে বেশ কিছুকাল ধরেই (স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে) কয়েকজন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক দেশের উপযোগী একটি জাতীয় তথা ভারতীয় নৃতত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব (Nationalist Anthropology) কখনই হিন্দু নৃতত্ত্ব বা উগ্র স্বাদেশিকতাসম্পৃক্ত কোন নৃতত্ত্ব নয়। এই নৃতত্ত্বচর্চায় নিয়োজিত নৃতাত্ত্বিকরা পশ্চিমী নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন, পদ্ধতিগুলিকে শিখেছিলেন এবং তারপর দেশগঠনের কাজে নৃতত্ত্ববিদ্যাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। এরকম কয়েকজন নৃতাত্ত্বিকের গবেষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এ নিয়ে আরও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন।

এই জাতীয়তাবাদী নৃতাত্ত্বিকরা পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করেননি আবার হিন্দু সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যেই নৃতত্ত্বের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার লুকিয়ে আছে এমনটাও মনে করতেন না। বরং দেশগঠনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে নৃতত্ত্বকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এটাই ছিল ওদের চিন্তা। জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের এই প্রচেষ্টার বীজ বপন হয়েছিল মাত্র। বিশাল মহীরুহ দূরের কথা ছোটখাটো বৃক্ষও আমরা দেখতে পেলাম না। হয়ত সেকারণেই স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সুরজিৎ সিংহের মত নৃতাত্ত্বিক ভারতীয় নৃতত্ত্বকে পশ্চিমী নৃতত্ত্বের অন্ধ অনুসরণকারী একটি বিদ্যা হিসেবেই দেখেছেন। এবার জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের কাহিনী শুরু করা যাক।

ঠিক যে বছর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ হিন্দু নৃতত্ত্ব প্রবন্ধটি লেখেন সেই বছরই ভারতীয় নৃতত্ত্বের এক পথিকৃৎ শরৎচন্দ্র রায় ইংল্যান্ডের সুবিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পত্রিকা Man-এ নৃতত্ত্বের একটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিকে জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের প্রথম প্রতিনিধি বলা যায়। উক্ত প্রবন্ধে রায় তদানীন্তন পশ্চিমী তত্ত্বগুলিকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে সমালোচনা করেন এবং একইসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবনার সঙ্গে পশ্চিমী ভাবধারার সম্মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেন। নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র রায়ের এই প্রচেষ্টা আজও আধুনিক। রায়ের মতে ভারতীয় দর্শনের মূল কথা হল আত্মানুসন্ধানী মনন প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'অন্য সংস্কৃতির' (Other Culture) অন্তরেপ্রবেশ। এর সঙ্গে পশ্চিমী বস্তুবাদী পদ্ধতির মিলন ঘটানোই হল আসল কথা। রায়ের নিজস্ব ভাষায় শোনা যাকঃ

"আজ ভারতের অধিকতর বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তকরা বিশ্বজনীন আত্মসন্ধানে প্রাচীন ও আদর্শ সংস্কৃতির কাছেই ফিরতে চাইছেন। এই

আত্মানুসন্ধানে ব্যক্তি ও সামাজিক সম্মিলনের মাধ্যমে উন্নততর জাতীয় চরিত্রের পুনর্গঠন সম্ভব। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রত্যেক সংস্কৃতি ও দেশের মধ্যে সর্বজনীন আত্মার সন্ধান মেলে বটে কিন্তু সকল জাতি ও সংস্কৃতিগুলিকে একই ছাঁচে ঢালাই করা সম্ভব নয়। অতীত ও বর্তমান, নব্য ও পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত সম্মিলনই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।" (রায় ১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র রায়ের কাছে ভারতীয় নৃতত্ত্ব গড়ে তোলা শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উনিই প্রথম ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক যিনি ১৯২১ সালে Man in India নামে বৈজ্ঞানিক পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। আজও নৃতত্ত্বের এই পত্রিকাটি সগৌরবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রায়ের মূল লক্ষ্য ছিল নৃতত্ত্বের একটি ভারতীয় ধারা গড়ে তোলা। Man in India পত্রিকার ১৯৮৫ সালের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুরজিৎ সিংহের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়ঃ "Man in India পত্রিকায় শরৎচন্দ্র রায়ের উদ্যোগের পিছনে ছিল তদানীন্তন জাতীয় চাহিদা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রায়ের ব্যক্তিগত গর্ব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়ে রায় ভারতীয় গবেষকদের পশ্চিমের পণ্ডিতদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। ফলত এই বৈজ্ঞানিক পত্রিকাটিতে ভারতীয় নৃতত্ত্বের পথপ্রদর্শক প্রায় সমস্ত পশ্চিমী এবং ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যায়" (সিংহ ১৯৮৫)।

একথা বলাই যথেষ্ট যে শরৎচন্দ্র রায় একজন অন্ধ জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। Man in India পত্রিকায় বহু পশ্চিমী নৃতাত্ত্বিক ভারত সম্পর্কে তাঁদের মৌলিক গবেষণাপত্রগুলি লেখেন। এ বিষয়ে সঙ্গীতা দাশগুপ্তের শরৎচন্দ্র রায়ের উপর রচিত মূল্যবান প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করলামঃ "রায় তাঁর দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় জীবনে বিবর্তনবাদ ও পরিচালনবাদের উত্থান এবং পতন দুই-ই দেখেছিলেন। একইসঙ্গে উনি দেখেছিলেন উপযোগিতামূলক ক্রিয়াবাদের উত্থান। বিভিন্ন সময়ে উক্ত ইউরোপীয় তত্ত্বগুলিকে উনি ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছিলেন। একই সঙ্গে রায় ছিলেন হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী। জীবনের শেষ প্রান্তে রায় নৃতত্ত্বে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। রায়ের বিশ্বাস ছিল যে নৃতত্ত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন উপাদানের মিলন ঘটিয়ে একীকরণ ঘটাতে সক্ষম" (দাশগুপ্ত ২০০৭)।

শরৎচন্দ্র রায়ের জাতীয়তাবাদী নৃতাত্ত্বিক চেতনা কখনই অন্ধ হিন্দুত্ববাদ কিংবা পশ্চিমী নৃতত্ত্বের অনুগামী ছিল না। রায়ের জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব ছিল একান্তই ভারতীয়।

এরপর আমরা সংক্ষেপে তিনজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নৃতাত্ত্বিকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব। এই তিনজন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক হলেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১), বিরজাশঙ্কর গুহ (১৮৯৪-১৯৬১) এবং তারকচন্দ্র দাশ (১৮৯৮-১৯৬৪)।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিশোর বয়সেই ভূপেন্দ্রনাথ তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেন। এরপর তিনি ছদ্মবেশে আমেরিকা যাত্রা করেন ও ১৯৪২ সালে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি ও ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি বার্লিনে আসেন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি ভূপেন্দ্রনাথ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যান এবং ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে নৃতত্ত্বে জার্মানীর হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। দত্তের গবেষণা ছিল সবসময়ই ভারতবিষয়ক। তিনি বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন ও বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। শরৎচন্দ্র রায়ের প্রখ্যাত Man in India পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ওঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতীয় সমাজপদ্ধতি (১৯৫৬), বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব (১৯৪৫), বাংলার ইতিহাস (১৯৬৩), Dialectics of Hindu Ritualism(1950), Hindu Law of Inheritance (1957), Swami Vivekananda: Patriot-Prophet-A Study (1954) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভূপেন্দ্রনাথের Man in India পত্রিকায় ১০টি প্রবন্ধের মধ্যে ভারতে বর্ণজাতি ব্যবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জাতি সম্পর্কিত প্রবন্ধদুটি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের জাতিবিষয়ক প্রবন্ধটি ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। ওই সময় ভারতীয় নৃতত্ত্বে গবেষণার মূল বিষয় ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈহিক ও সমাজ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিবর্তন। ভূপেন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে আদিবাসী সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতিগোষ্ঠীগুলির বিষয়ে গবেষণা করেছেন অবলীলায়। তুলে ধরেছেন জাতিগুলির সামাজিক পরিবর্তনের কাহিনী। ভূপেন্দ্রনাথ লিখিত দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থ Dialectics of Hindu Ritualism প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। প্রকাশক গুপ্তপ্রেস। শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন বইটির উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন ভারত পুনর্গঠনের জন্যই যে এর প্রয়োজন গ্রন্থের ভূমিকাতেই লেখক সেকথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরই বলা প্রয়োজন ভূপেন্দ্রনাথের ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ Hindu Law of Inheritance (An Anthropological Study)-র কথা। এই বইটিতে লেখক হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মার্কসীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য যে ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাসে কিংবা পাঠক্রমে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিদেশী নৃতাত্ত্বিকদের তত্ত্ব আলোচিত অথচ আগাগোড়া ভারতীয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় সম্পৃক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান আজও উপেক্ষিত। নৃতত্ত্বের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হোক এটাই কামনা।

বিরজাশঙ্কর গুহ

বিরজাশঙ্কর গুহ আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে ফিরে এসে ১৯২৭ সালে গুহ ভারতীয় প্রাণীবিজ্ঞান সর্বেক্ষণ (Zoological Survey of India) সংস্থায় নৃবিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। প্রাণীবিজ্ঞান সংস্থায় যোগদান

করার পর থেকেই বিরজাশঙ্করের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণ প্রতিষ্ঠা করা। বেশ কয়েক বছরের চেষ্টায় ১৯৪৫ সালে গুহ অবশেষে ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণ (Anthropological Survey of India) প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংস্থার প্রধান পরিচালক (Director) হিসেবে যোগদান করেন। ওই সময় ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের সহ-পরিচালক (Deputy Director) ছিলেন প্রবাদপ্রতিম নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন। গুহ শুধু একজন শারিরীক নৃবিজ্ঞানী ছিলেন না, উনি একই সঙ্গে ছিলেন একজন সমাজ সচেতন সমাজবিজ্ঞানী। ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের গবেষণা যাতে নৃতত্ত্ব ও নতুন ভারত গঠনে কাজে লাগে এবং একই সঙ্গে নৃতত্ত্ব যেন একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এগুলিই ছিল বিরজাশঙ্কর গুহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। পঞ্চাশের দশকে গুহ একটি গবেষক দলের প্রধান হিসেবে তদানীন্তন উদ্বাস্তু সমস্যার উপর একটি সর্বাঙ্গীন সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দুটি উদ্বাস্তু কলোনীর উপর গুহর নেতৃত্বে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল তার শিরোনাম 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা বিষয়ক অধ্যয়ন' (১৯৫৯)। এই বইটি বিরজাশঙ্করের সম্পাদনায় ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণ থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত সমীক্ষায় গুহ ব্রিটিশ সরকারের বিভাজনের মাধ্যমে শাসনের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেই যে উদ্বাস্তু সমস্যা তৈরী হয়েছিল সেকথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন। এই সমীক্ষায় যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তাহল উদ্বাস্তুদের সামাজিক উত্তেজনা সম্পর্কিত বিপুল পরিমাণ তথ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুহ কখনই পশ্চিমী কোন তাত্ত্বিকদের দ্বারস্থ হননি, নিজেদের সংগৃহীত তথ্যাবলীর বাইরে গিয়ে তত্ত্বনির্মাণের চেষ্টা করেন নি। উদ্বাস্তুদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনার কারণ খুঁজতে গিয়ে গুহ দেখেছিলেন যে সরকারী ব্যবস্থাই গৃহহীন মানুষগুলিকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। ওঁর পরামর্শ ছিল উদ্বাস্তুদের ক্ষমতায়ন করতে হবে, ওদের সঙ্গে বসে পুনর্বাসন প্রকল্প বানাতে হবে, দেশ গঠনের কাজে উদ্বাস্তুদের অংশগ্রহণই হবে নতুন ভারত তৈরির মূলমন্ত্র। স্বাধীনতার অব্যবহিত কালে একমাত্র সুরজিৎ সিংহ ছাড়া আর কোন নৃতাত্ত্বিক উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে এরকম মানবিক এবং নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষালব্ধ তথ্য সহযোগে পরামর্শ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। প্রায় একই সময়ে ১৯৫৮ সালে বিরজাশঙ্কর গুহ প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা Sociological Bulletin-এ একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'জাতি গঠনে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা'। এটি গুহ-র একটি দৃষ্টান্তমূলক রচনা, যা আজও পণ্ডিতমহলে উপেক্ষিত। উক্ত প্রবন্ধে গুহ নানা তথ্য ও যুক্তি সহযোগে বলেন যে, যদি আমরা বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য বুঝতে না পারি তাহলে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' শুধুই একটি পল্লবগ্রাহী আহবানেই পর্যবসিত হবে। ওই প্রবন্ধেই গুহ নৃবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস কিংবা কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের (Undue Weightage) সমালোচনা করেন। গুহর মতে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক একাত্মতাকে যেমন অধ্যয়ন করতে হবে, তেমনি একই সঙ্গে বুঝতে হবে তাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পদ্ধতি ও কারণাবলী। আর এই বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রবন্ধের শেষভাগে গুহর পরামর্শ ছিল যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সমাজবিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি কল্পে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। দেশ ও জাতি গঠনে নৃতাত্ত্বিক বিরজাশঙ্কর গুহর অবদান তাই আজও প্রাসঙ্গিক।

তারকচন্দ্র দাশ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে যে সমস্যাগুলি তদানীন্তন ভারতবাসীর সামনে তাদের ভয়ংকর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তার মধ্যে ১৯৪৩-৪৪ এর বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ নিঃসন্দেহে অন্যতম। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন যেমন স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের প্রধান সমস্যাবলী, তেমনই ১৯৪৩-র বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ ছিল এমনই এক সমস্যা যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মারা যান এবং গৃহহারা হন। অথচ দেশের এইরকম একটি মানবিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে তদানীন্তন সমাজবিজ্ঞানীরা সে রকম কোন সমীক্ষা চালাননি। যে কয়েকজন ব্যতিক্রমী সমাজবিজ্ঞানী বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ ও পুনর্বাসন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাশ। ভারতে জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্ব তথা দেশগঠনের কাজে নৃতত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে তারকচন্দ্র দাশের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তারকচন্দ্র দাশ দেশ ও বিদেশের নৃতাত্ত্বিক মহলে উত্তর-পূর্ব ভারতের পুরুম কুকিদের উপর তাঁর লেখা The Purums: An Old Kuki Tribe of Manipur (১৯৪৫) বইটির জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন। তারকবাবুর যে কাজটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটির শিরোনাম Bengal Famine (1943): As revealed in a Survey of the Destitutes of Calcutta (১৯৪৯)। যে সময় ভারতীয় এবং বিদেশী নৃতাত্ত্বিকরা আদিবাসী সমাজ ও হিন্দুবর্ণ-জাতিব্যবস্থার অধ্যয়নে নিবিষ্ট সেই সময় তদানীন্তন রাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদের সামনে বাংলার দুর্ভিক্ষ ছিল এক চ্যালেঞ্জ। তারকচন্দ্র দাশ তার অত্যন্ত সীমিত অর্থ ও লোকবল নিয়েই মহাদুর্ভিক্ষের মত জটিল ও বৃহৎ একসামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলায় নেমে পড়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের কিছুছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-গবেষকদের নিয়ে কলকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের উপর পুরোদস্তুর নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা চালান দাশ। একই সঙ্গে উনি দক্ষিণ কলকাতার একটি লঙ্গরখানাও চালাতেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের জন্য। দাশের মহামূল্যবান পুস্তকটির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচিত হয়। তদানীন্তন দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধানকারী কমিশন দাশের বেশ কিছু পরামর্শ গ্রহণ করে। জহরলাল নেহরু উক্ত সমীক্ষার কথা তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Discovery of India তে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের উপর তাঁর লেখায় দাশের বহু তথ্যের উল্লেখ করেন। এক কথায় দেশগঠনের কাজে বাংলার মহাদুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের পুনর্বাসন

পরিকল্পনা সম্পর্কিত দাশের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী ও প্রায়োগিক নৃতত্ত্বের সুযোগ্য ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার অধিকারী।

উপসংহার

ভারতে জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বের উৎস ও তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরাটাই ছিল বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাস রচনায় জাতীয়তাবাদী তথা দেশগঠনের কাজে নৃতত্ত্বের ভূমিকার কথা আজ পর্যন্ত গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠেনি। যে সমস্ত নৃতাত্ত্বিকরা ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা হয় ভারতে নৃতত্ত্ব চর্চাকে পশ্চিমীধারার অনুকরণ হিসেবে দেখেছেন, যেমন সুরজিৎ সিংহ; অথবা প্রাচীন ভারতে নৃবিজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল এমনভাবে ভেবেছেন যেমননির্মলবসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও অজিত দণ্ড। বর্তমান প্রবন্ধের সাহায্যে আমি এটাই দেখেতে চেয়েছি যে উপনিবেশিক ধারায় নৃতত্ত্বচর্চার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক (যেমন শরৎচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিরজাশঙ্কর গুহ ও তারকচন্দ্র দাশ) দেশেরউপযোগী, বৈজ্ঞানিক ও জাতীয়তাবাদী নৃতত্ত্বচর্চার একটি ধারা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। নৃতত্ত্বচর্চার এই জাতীয়তাবাদী ধারা কেন পরবর্তীকালে যথেষ্ট পরিপুষ্ট হয়ে উঠল না সেটাই ভবিষ্যতের গবেষণার বিষয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই লেখা তৈরির জন্য সবসময় উৎসাহ যুগিয়েছে আমার বন্ধু ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের অম্লান বিশ্বাস। অম্লানের তাগাদা এবং উৎসাহ না থাকলে এ লেখা তৈরিই হতনা। এছাড়া আমি কৃতজ্ঞ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চের কাছে। ওই সংস্থার সিনিয়র ফেলো হিসেবে ভারতীয় নৃতত্ত্বের জাতীয়তাবাদী উৎস নিয়ে গবেষণা করার সুবাদেই এই প্রবন্ধ লেখার রসদ সংগ্রহ করি। কলকাতার ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস ও ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ওই সংস্থাদুটির গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেবার জন্য।

তথ্যসূত্র

Basu, A and Biswas, S.K. (1980). Is Indian Anthropology Dead/Dying? Journal of the Indian Anthropological Society. Vol.15; PP. 1-14.

Be'teille, A. (1997). Newness in Sociological Enquiry, Sociological Bulletin. Vol. 46, PP. 97-110.

Bose, N.K. (1953). Cultural Anthropology and Other Essays. Calcutta: Indian Associated Publishing Company Ltd.

Chattopadhyaya, D. (1959). Lokayata: A Study of Ancient Indian Materialism. New Delhi: People's Publishing House.

Danda, A. (2017). Anthropology in Contemporary India. Journal of the Indian Anthropological Society. Vol.52, PP. 4-16

Bose, P. (2007). The Anthropologist as 'Scientist'? Nirmal Kumar Basu. In P. Uberoi, N.Sundar, and S. Deshpande (Eds). Anthropoloy in the east : founders of Indian Sociology and anthropology (pp. 290-329). Ranikhrt : Permanent Block

Nirmal Kumar Bose. In P. Uberoi, N. Sundar and S. Deshpande (Eds.). Anthropology in the east: founders of Indian sociology and anthropology (PP. 290-329). Ranikhet: Permanent Block.

Dasgupta, S (2007). Recasting theOraons and the 'Tribe' Sarat Chandra Roy's Anthropology.

In P. Oberoi, N. Sundar and S. Deshpande (Eds.).

Anthropology in the East: Founders of Indian Sociology and Anthropology (PP. 132-171). Ranikhet: Permanent Block.

Debnath, B. (1949). Crisis of Indian Anthropology. Economic and Political Weekly. Vol 34: 3110-3114.

Ghosh, J.C. (1938). Hindu Anthropology [Anthropological Papers (New Series)]. Calcutta: Calcutta University Press.

Guha, A. (2011). Tarak Chandra Das: A Marginalised Anthropologist. Sociological Bulletin. Vol. 60, PP. 245-265.

Guha, A. (2018). Nationalist Anthropology. The Statesman, 24th February, 2018, P. 8.

Guha, A. (2018). Scrutinising the Hindu Method of Tribal Absorption. Economic and Political Weekly. Vol. 53, PP. 105-110

Guha, A. (2019). Colonial, Hindu and Nationalist Anthropology in India. Sociological Bulletin, Vol. 68, PP. 154-168.

Guha, B.S. (1958). The Role of Social Sciences in Nation Building. Sociological Bulletin, Vol. 7, PP. 148-151.

Guha, B.S. (1959). Social Tensions Among the Refugees from Eastern Pakistan. Calcutta: Govt. of India.

Ray, S.K. (1974). Bibliographies of Eminent Indian Anthropologists (with life-sketches). Calcutta: Anthropological Survey of India, Govt. of India, Indian Museum.

Roy, S.C. (1938). An Indian Outlook on Anthropology. Man, Vol. 38; PP. 146-150

Roy Burman, J.J. (2011). Tragedy of Culture in Indian Anthropology. Mainstream 69 (12): 1-2

Sinha, S. (1971). Is There an Indian Tradition in Social/Cultural Anthropology: Retrospect and Prospect? Journal of the Indian Anthropological Society. Vol. 6, PP. 1-14.

Sinha, S. (1974). Foreword. In S.K. Ray (Ed.) Bibliographies of Eminent Indian Anthropologists (with life-sketches). Calcutta: Anthropological Survey of India, Govt. of India, Indian Museum.

Sinha, S.C. (1985). Editorial. Man in India. Vol. 65, PP. III-V.

Uberoi, P. Sundar, N. and S. Deshpande (2007). Introduction. In P. Uberoi, N. Sundar, and S. Deshpande (Eds.).

Anthropology in the east: founders of Indian sociology and anthropology (PP. 1-63). Ranikhet: Permanent Block.